Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়-বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া রহমান

রোলঃ 227020147228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়-বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া রহমান

রোলঃ 227020147228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে ন্যায়-বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া রহমান, আইডিঃ 227020147228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে ন্যায়-বিচার: আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সুমাইয়া রহমান

আইডিঃ 227020147228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ন্যায়বিচারের ধারণা (Concept of Justice in Islam) 5

ন্যায়বিচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical Foundations): 6

বিচার প্রক্রিয়া ও রীতি (Judicial Procedures): 11

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা 12

ইসলামে ন্যায় বিচারের গুরুত্ব 15

শরয়ি আইন-বিধির প্রয়োগ 18

আধুনিক সমাজে প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধারের পথগুলো 21

আধুনিক বিচারব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রয়োগ 22

উপসংহার 29

ভূমিকা

ইসলামে ন্যায়বিচার (আদল) একটি মৌলিক ও অপরিহার্য নীতি, যা কোরআন, হাদিস ও ইসলামী শরিয়াহর মূল ভিত্তি। আধুনিক সমাজে এই নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা একটি ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারি।
ইসলামে ন্যায়বিচার কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, যা মানবতার কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত।

ন্যায়বিচারের ধারণা (Concept of Justice in Islam)

ইসলামী পরিভাষায় ন্যায়বিচারকে **"আদল"** (عدل) বলা হয়, যা আরবি শব্দ "আদালা" (عدل) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সমতা, ভারসাম্য ও ন্যায্যতা। ইসলামে ন্যায়বিচার কেবল আইনগত প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিশ্চিত করে। এর মূল ভিত্তি হলো:

- **স্রষ্টার নির্দেশ:** আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের আদেশ দেন..."** (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)।
- **সাম্য ও ভারসাম্য:** সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর সৃষ্টিনীতি ন্যায় ও ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা আর-রহমান, ৫৫:৭-৯)।
- **মানবাধিকার:** ইসলামে ন্যায়বিচার মানুষের মৌলিক অধিকার, যা বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে প্রযোজ্য।

.

ন্যায়বিচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical Foundations):

ক. কুরআন ও সুন্নাহ:

- **কুরআন:**
  - o **সূরা আন-নিসা ১৩৫:** *"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী হও... যদি তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই যায়।"*
  - o **সূরা আল-মায়িদা ৮:** *"অন্যায়কারীদের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত না করে।"*
- **সুন্নাহ:**
  রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"ন্যায়বিচারের আসনে বসা একজন মানুষের জন্য একদিনের সদকা করা থেকেও উত্তম।"*(তিরমিজি)। তিনি নিজে মক্কা বিজয়ের সময়ও প্রতিপক্ষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছিলেন।

খ. শরিয়ার মূলনীতি:

- **মাকাসিদ আশ-শরিয়া:** ইসলামী আইনের লক্ষ্য হলো মানুষের **ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ** রক্ষা করা। ন্যায়বিচার এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের চাবিকাঠি।
- **উসুল আল-ফিকহ:** ইসলামী আইনশাস্ত্রে ন্যায়বিচারকে "ইস্তিহসান" (ন্যায়সংগত পছন্দ) ও "মাসলাহা" (জনকল্যাণ) এর মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

গ. দার্শনিক ভিত্তি:

- **তাওহিদের ধারণা:** আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ন্যায়বিচারের ভিত্তি। সকল মানুষ আল্লাহর দাস হিসেবে সমান, তাই কারো প্রতি বৈষম্য জায়েজ নয়।
- **আখিরাতের জবাবদিহিতা:** ন্যায়বিচার কেবল পার্থিব বিষয় নয়; এটি আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অংশ।
- **আমানত:** মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (সূরা আল-বাকারা, ২:৩০)

ইসলামে ন্যায়বিচারের ধারণা কুরআন ও হাদিসের গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বিচার শুধু আইনগত বিধানই নয়, বরং এটি ঈমানের অঙ্গ ও সমাজের মৌলিক

স্তম্ভ। নিম্নে কুরআন, হাদিস ও রাসুল (সা.)-এর জীবনের আলোকে ন্যায়বিচারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হলো-

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ন্যায়বিচার:

১. কুরআনে ন্যায়বিচার: নির্দিষ্ট আয়াতের বিশ্লেষণ

কুরআনে ন্যায়বিচারের আদেশ অসংখ্য আয়াতে এসেছে, যা বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন নীতির প্রতিফলন:

ক. সূরা আন-নিসা (4:135):

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী হও, আল্লাহর সাক্ষী হও—এমনকি যদি তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও যায়...।"

- **বিশ্লেষণ:** এই আয়াতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, পারিবারিক সম্পর্ক বা সামাজিক চাপের ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এটি ইসলামের **সর্বজনীন ন্যায়বিচার** (Universal Justice)-এর ধারণাকে শক্তিশালী করে, যেখানে কোনো পক্ষপাত বা ভয়ভীতির স্থান নেই।

খ. সূরা আল-মায়িদা (5:8):

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদানকারী হও। কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা তোমাদের যেন ন্যায়বিচার করতে বাধা না দেয়। ন্যায়বিচার করো, তা তাকওয়ার নিকটতর।"

- **বিশ্লেষণ:** এ আয়াতে শত্রুতা বা বিদ্বেষের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার বিচ্যুত হওয়া নিষিদ্ধ। এটি **নিরপেক্ষতা** ও **নৈতিক সাহসের** শিক্ষা দেয়।

গ. সূরা শুরা (42:15):

"তুমি বলো, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর কিতাবের প্রতি এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে।"

- **বিশ্লেষণ:** ন্যায়বিচারকে ঈমানের সাথে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে, যা মুমিনের জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।

ঘ. সূরা আল-হুজুরাত (49:9):

"যদি দুই দল মুমিন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করো। অতঃপর যদি একপক্ষ অপরপক্ষের উপর জুলুম করে, তবে জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো... যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"

- **বিশ্লেষণ:** এ আয়াতে **সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ** দেওয়া হয়েছে, যা সামাজিক শান্তি রক্ষার চাবিকাঠি।

---

২. হাদিসে ন্যায়বিচারের বাস্তব উদাহরণ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে ন্যায়বিচারের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা বিদ্যমান:

ক. ন্যায়বিচারকারীর মর্যাদা:

রাসুল (সা.) বলেছেন,

"যারা ন্যায়বিচার করে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বারে উপবিষ্ট হবে।" (সহিহ মুসলিম)।

- **তাৎপর্য:** ন্যায়বিচারকে আখিরাতের সাফল্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

খ. সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ:

একটি হাদিসে এসেছে,

"পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে শুধু এ কারণে যে, যখন কোনো উচ্চবর্ণের ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ক্ষমা করে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তারা তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত।" (সহিহ বুখারি)।

- **তাৎপর্য:** আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব—শক্তিশালী ও দুর্বল সবার জন্য সমান বিচার।

গ. সাক্ষ্যদানে ন্যায়পরায়ণতা:

রাসুল (সা.) বলেছেন,

"মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া শিরকের সমতুল্য।" (সুনান আবু দাউদ)।

- **তাৎপর্য:** ন্যায়বিচারের জন্য সত্যনিষ্ঠ সাক্ষ্য অপরিহার্য।

---

৩. রাসুল (সা.)-এর জীবনে ন্যায়বিচারের চর্চা

রাসুলুল্লাহ (সা.) শুধু ন্যায়বিচারের তত্ত্ব প্রচারই করেননি, বরং তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল ন্যায়নীতির বাস্তব রূপ:

ক. মক্কা বিজয়ে ক্ষমার নজির:

মক্কা বিজয়ের পর রাসুল (সা.) বলেছিলেন,

"আজকের দিনটি অনুগ্রহের দিন। তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।"

- **তাৎপর্য:** শত্রুর প্রতিও ন্যায় ও ক্ষমার আদর্শ প্রতিষ্ঠা।

খ. বনু কুরাইজার ফয়সালা:

মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজার সাথে চুক্তি ভঙ্গের পর রাসুল (সা.) তাদেরকে নিজেদের বিচারক নির্বাচনের সুযোগ দেন। তারা সাদ ইবনে মুআজ (রা.)-কে বিচারক হিসেবে পছন্দ করলেন, যিনি তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুযায়ী শাস্তির রায় দেন।

- **তাৎপর্য:** শত্রুপক্ষের বিচারব্যবস্থার প্রতি সম্মান ও ন্যায়বিচার।

গ. ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায়নীতি:

- **উদাহরণ ১:** একবার এক মহিলা চুরি করলে কুরাইশ নেতারা তার শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ করলেন। রাসুল (সা.) ক্রোধিত হয়ে বললেন, **"আল্লাহর কসম! যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কাটতাম।"** (সহিহ বুখারি)।
- **উদাহরণ ২:** হিলফুল ফুযুল নামক জাহেলি যুগের ন্যায়বিচারমূলক চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেছিলেন, **"আমি এখনো সেই চুক্তিকে সমর্থন করি।"**

ঘ. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার:

রাসুল (সা.) বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মুনাফাখোরি, গরিবদের শোষণ ও পণ্য মজুদ করাকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি বলতেন, **"যে ব্যক্তি মুসলিমদের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।"** (সহিহ মুসলিম)।

ঙ. ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার:

মদিনা সনদে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রদায়গত অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এটি ছিল **বহুসংস্কৃতিবাদী সমাজে ন্যায়বিচারের প্রথম লিখিত সংবিধান**।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গঠন (Structure of Islamic Judiciary):

ক. কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব:

- **খলিফা/ইমাম:** খলিফা হলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ও বিচার বিভাগের প্রধান। তার দায়িত্ব হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিচারক (কাজি) নিয়োগ দেওয়া।
    - উদাহরণ: হযরত উমর (রা.) নিজে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদকে কাজি নিয়োগ দিতেন।

খ. বিচারিক প্রতিষ্ঠান:

১. মাহাকিম আল-কাদা (বিচারালয়):

- **কাজি (বিচারক):** শরিয়াহ আইনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার রায় দেন।
- **শর্তাবলি:** কাজি হতে হলে তাকে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের, ন্যায়পরায়ণ, ইসলামী আইনে পণ্ডিত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হতে হবে।
- **নিয়োগ:** খলিফা বা স্থানীয় গভর্নর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত।

২. হিসবা প্রতিষ্ঠান:

- **মুহতাসিব:** জনগণের নৈতিক ও সামাজিক আচরণ তদারকি করা, বাজার নিয়ন্ত্রণ, জুলুম প্রতিরোধ এবং শরিয়াহর লঙ্ঘন রোধ করা তার দায়িত্ব।
- উদাহরণ: হযরত উমর (রা.) মদিনায় মুহতাসিব নিয়োগ দিয়েছিলেন।

৩. মাজালিম আদালত:

- **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল:** রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বা শাসকগণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত হয়।
- খলিফা বা তার প্রতিনিধি সরাসরি এই আদালত পরিচালনা করতেন।

বিচার প্রক্রিয়া ও রীতি (Judicial Procedures):

ক. মামলা দায়ের ও শুনানি:

- **আবেদন:** যে কোনো নাগরিক মৌখিক বা লিখিতভাবে মামলা দায়ের করতে পারত।
- **খোলামেলা শুনানি:** বিচার প্রক্রিয়া প্রকাশ্য ও স্বচ্ছ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।
- **পক্ষপাতমুক্ততা:** কাজিকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হতো। রাসুল (সা.) বলেছেন, *"যে ব্যক্তি বিচারকালে পক্ষপাত করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"* (তিরমিজি)।

খ. সাক্ষ্য ও প্রমাণ:

- **সাক্ষী:** ইসলামী আইনে দুইজন সৎ পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক (সূরা আল-বাকারা ২:২৮২)। নারী সাক্ষ্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।
- **লিখিত প্রমাণ:** চুক্তি, দলিল বা শারীরিক প্রমাণ (যেমন: আঘাতের চিহ্ন) গ্রহণযোগ্য।
- **শপথ:** প্রমাণের অভাবে বিবাদী বা বাদীকে শপথ নিতে বলা হতো।

গ. রায় ও শাস্তি:

- **রায় প্রদান:** কাজি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রায় দিতেন।
- **শাস্তির প্রকার:**

১. **হুদুদ:** আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘনের শাস্তি (যেমন: ব্যভিচার, চুরি)।
২. **কিসাস:** সমতুল্য প্রতিশোধ (হত্যা বা আঘাতের ক্ষেত্রে)।
৩. **তাজির:** বিচারকের বিবেচনামূলক শাস্তি (সমাজের শৃঙ্খলার জন্য)।
৪. **দিয়াত:** রক্তপণের মাধ্যমে সমঝোতা।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

খোলাফায়ে রাশেদার যুগ ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণালি-বর্ণালি অধ্যায়। তাঁদের কর্মপদ্ধতি-আদর্শ ও সামগ্রিক জীবনাখ্যান মানবতার জন্য সর্বোত্তম নমুনা। মূলত ৬৩২ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বলা হয়। রাষ্ট্রে আইনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ধনী-গরিব, দুর্বল-সবল-নির্বিশেষে সবার জন্য সমতার ভিত্তিতে ফায়সালা করাই মূল উদ্দেশ্য। ইসলামে এর যথার্থ প্রমাণ-উদাহরণ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ইসলামী রাষ্ট্র সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা।

বলা হয়েছে, ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; আল্লাহর জন্য ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবু।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৫)

তৎকালীন ইসলামী বিচারব্যবস্থায় বিচারপ্রাপ্তির জন্য খলিফাকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। খলিফা আলী (রা.) বর্ম হারিয়ে যাওয়ার পর তা এক ইহুদির কাছে দেখতে পেয়ে বিচারকের দারস্থ হন। বিচারক তাঁকে সাক্ষী পেশ করতে বললে তিনি তাঁর পুত্র ও দাসকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন।

কিন্তু বিচারক বললেন, পুত্রের সাক্ষী পিতার পক্ষে এবং কৃতদাসের সাক্ষী মনিবের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ফলে বর্মটি অভিযুক্ত ব্যক্তিরই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সেই ইহুদি এই বলে ইসলাম গ্রহণ করে, যে ধর্মে এমন সুবিচার রয়েছে, তা মিথ্যা ধর্ম হতে পারে না।

এ ছাড়া খলিফা ওমর (রা.) মদ্যপানের অপরাধে নিজের পুত্রকে বেত্রাঘাত করেন। এতে পুত্র আবু শাহমার মৃত্যু হয়।

ইসলামের ইতিহাস এমন দৃষ্টান্তে ভরপুর। নিম্নে খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচারব্যবস্থা কেমন ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

আবু বকরের যুগে বিচারব্যবস্থা:

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের যুগে বিচারকের জন্য স্বতন্ত্র ও আলাদা কোনো অবস্থান ছিল না। বরং ফকিহ সাহাবায়ে কেরাম বিচারব্যবস্থার বিষয়টি দেখভাল করতেন। মদিনা মুনাওয়ারায় খলিফা নিজেই মানুষের মাঝে বিচার করতেন। কখনো খলিফার আদেশে উমর (রা.)-ও বিচার করতেন। আর বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নররাই ছিলেন সেসব অঞ্চলের বিচারক। তাঁরা কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

উমর (রা.)-এর যুগে বিচারব্যবস্থা

উমর (রা.)-এর যুগে প্রথমবারের মতো মদিনায় কিছু সাহাবিকে বিচারের দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) ও আবু দারদা (রা.) অন্যতম। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে বিচারক নিয়োগ করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), শুরাহবিল ইবনুল হারিস আল-কিনদি ও উবায়দা আল-সালমানিকে কুফার বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব দেন। বিচারকার্যে শেষের দুজন দ্যুতিময় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদার যুগ ছাড়াও উমাইয়া খেলাফতকালেও তাঁরা মানুষের সেবায় বিচারকাজে নিয়োজিত ছিলেন।

অন্যদিকে উমর (রা.) সাহাবি উবাদাহ ইবনে উবাদাহ আস-সামিতকে হেমস (আলেপ্পো) ও কনসারাইনের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। এমন কার্যব্যবস্থার মাধ্যমে উমর (রা.) গভর্নরদের থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে নেন। এ কারণে বিচারকের অবস্থান অত্যধিক সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কারণ তিনি খলিফার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। (তারিখুল মদিনা : ২/৬৯৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৪০; ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৪৬)

তবে কিছু গভর্নর স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন; নিজস্ব দায়িত্ব পালনের পর বাড়তি সময়ে তাঁরা এ কাজটুকু করতেন। শত্রুসংলগ্ন প্রদেশগুলোর গভর্নররা সাধারণত এমন করতে পারতেন না। কারণ তাঁরা সামরিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সমধিক ব্যস্ত থাকতেন। উমর (রা.) তাঁর গভর্নরদের অসিয়ত করেছিলেন, যেন ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ও সৎ-শুদ্ধ লোকদের নির্বাচন করে বিচার বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, : ১/৪৫৪; রাওদাতুল কুদাত ওয়া তারিকুন নাজাত, পৃষ্ঠা ৮৬)

উসমান (রা.)-এর যুগে বিচারব্যবস্থা

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) কখনো কখনো বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আলাদা বিচারক নির্ধারণ করতেন। যেমন—কাআব ইবনে সুরকে বসরার বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আবার কখনো গভর্নরদের বিচারের দায়িত্ব দিতেন। যেমন—কাআব ইবনে সুরকে বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত করার পর বসরার তৎকালীন গভর্নরকে তিনি প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি বিচারকাজও করার আদেশ দেন। অনুরূপভাবে উসমান (রা.) ইয়ালা ইবনে উমাইয়াকে সানআর গভর্নর ও বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। (আত-তারিখ, পৃষ্ঠা ১৭৯)

তবে উসমান (রা.)-এর শাসনকালে বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নররা নিজ দায়িত্বে নিজেদের বিচারক নির্বাচন করতেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেন। বোঝা যায়, এতে করে তাঁর শাসনামলে গভর্নরদের ভিন্ন রকমের মনোভাব বেড়ে গিয়েছিল।

আলী (রা.)-এর যুগে শাসনব্যবস্থা

ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) নিজ দায়িত্বে কুফায় বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণত গভর্নরদের পক্ষ থেকে বিচারক নির্ধারণ করা হতো। তবে অনেক বিচারককে আলী (রা.) নিজেই নিয়োগ করেছিলেন। (আল-ওলায়া ফিল বুলদান : ০২/৯৩)

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচারব্যবস্থার উৎস ছিল কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা (ঐকমত্য), ইজতিহাদ ও পরামর্শ। তাঁদের যুগে সবচেয়ে বেশি ফিকাহতত্ত্ব ও বিধানজ্ঞানসম্পন্ন সাহাবা ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা, মুআজ ইবনে জাবাল, আবু মুসা আশ-আরি, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরাইরা, সালমান আল-ফার্সি, আবু সাইদ খুদরি ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জায়েদ ইবনে সাবেদ প্রমুখ সাহাবি (রা.)। (আলামুল মুআক্কিয়িন : ১/ ১৩)

ইসলামে ন্যায় বিচারের গুরুত্ব

ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যই হলো প্রত্যেককে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া। সমাজের প্রত্যেকে যদি তার প্রাপ্য অংশ পায়, তবে সেখানে কোনো রকম ঝগড়া-ফ্যাসাদ, অশান্তি ও হানাহানি থাকে না।

এ কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিময় সমাজ ছিল নবি-রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ। আর তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রধান ভিত্তিই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এটা তাদের দায়িত্ব ছিল। আর এ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

আল্লাহতায়ালা আল কুরআনের বহু স্থানে নবি ও রাসূলদের সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের ওপর কিতাব ও মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানবজাতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লোহাও নাজিল করেছি, যার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের অনেক কল্যাণ আছে।

এ জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

রাশেদার যুগ ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণালি-বর্ণালি অধ্যায়। তাঁদের কর্মপদ্ধতি-আদর্শ ও সামগ্রিক জীবনাখ্যান মানবতার জন্য সর্বোত্তম নমুনা। মূলত ৬৩২ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বলা হয়।
রাষ্ট্রে আইনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ধনী-গরিব, দুর্বল-সবল-নির্বিশেষে সবার জন্য সমতার ভিত্তিতে ফায়সালা করাই মূল উদ্দেশ্য। ইসলামে এর যথার্থ প্রমাণ-উদাহরণ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ইসলামী রাষ্ট্র সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা

করতে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা।

বলা হয়েছে, ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; আল্লাহর জন্য ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবু।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৫)

তৎকালীন ইসলামী বিচারব্যবস্থায় বিচারপ্রাপ্তির জন্য খলিফাকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। খলিফা আলী (রা.) বর্ম হারিয়ে যাওয়ার পর তা এক ইহুদির কাছে দেখতে পেয়ে বিচারকের দারস্থ হন। বিচারক তাঁকে সাক্ষী পেশ করতে বললে তিনি তাঁর পুত্র ও দাসকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন।

কিন্তু বিচারক বললেন, পুত্রের সাক্ষী পিতার পক্ষে এবং কৃতদাসের সাক্ষী মনিবের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ফলে বর্মটি অভিযুক্ত ব্যক্তিরই রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সেই ইহুদি এই বলে ইসলাম গ্রহণ করে, যে ধর্মে এমন সুবিচার রয়েছে, তা মিথ্যা ধর্ম হতে পারে না।

এ ছাড়া খলিফা ওমর (রা.) মদ্যপানের অপরাধে নিজের পুত্রকে বেত্রাঘাত করেন। এতে পুত্র আবু শাহমার মৃত্যু হয়।

ইসলামের ইতিহাস এমন দৃষ্টান্তে ভরপুর। নিম্নে খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচারব্যবস্থা কেমন ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

আবু বকরের যুগে বিচারব্যবস্থা

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের যুগে বিচারকের জন্য স্বতন্ত্র ও আলাদা কোনো অবস্থান ছিল না। বরং ফকিহ সাহাবায়ে কেরাম বিচারব্যবস্থার বিষয়টি দেখভাল করতেন। মদিনা মুনাওয়ারায় খলিফা নিজেই মানুষের মাঝে বিচার করতেন। কখনো খলিফার আদেশে উমর (রা.)-ও বিচার করতেন। আর বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নররাই ছিলেন সেসব অঞ্চলের বিচারক। তাঁরা কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

উমর (রা.)-এর যুগে প্রথমবারের মতো মদিনায় কিছু সাহাবিকে বিচারের দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) ও আবু দারদা (রা.) অন্যতম। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে বিচারক নিয়োগ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), শুরাহবিল ইবনুল হারিস আল-কিনদি ও উবায়দা আল-সালমানিকে কুফার বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব দেন। বিচারকার্যে শেষের দুজন দ্যুতিময় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদার যুগ ছাড়াও উমাইয়া খেলাফতকালেও তাঁরা মানুষের সেবায় বিচারকাজে নিয়োজিত ছিলেন।
অন্যদিকে উমর (রা.) সাহাবি উবাদাহ ইবনে উবাদাহ আস-সামিতকে হেমস (আলেপ্পো) ও কনসারাইনের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। এমন কার্যব্যবস্থার মাধ্যমে উমর (রা.) গভর্নরদের থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে নেন। এ কারণে বিচারকের অবস্থান অত্যধিক সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কারণ তিনি খলিফার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। (তারিখুল মদিনা : ২/৬৯৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৪০; ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৪৬)
তবে কিছু গভর্নর স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন; নিজস্ব দায়িত্ব পালনের পর বাড়তি সময়ে তাঁরা এ কাজটুকু করতেন। শত্রুসংলগ্ন প্রদেশগুলোর গভর্নররা সাধারণত এমন করতে পারতেন না। কারণ তাঁরা সামরিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সমধিক ব্যস্ত থাকতেন। উমর (রা.) তাঁর গভর্নরদের অসিয়ত করেছিলেন, যেন ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ও সৎ-শুদ্ধ লোকদের নির্বাচন করে বিচার বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, : ১/৪৫৪; রাওদাতুল কুদাত ওয়া তারিকুন নাজাত, পৃষ্ঠা ৮৬)

উসমান (রা.)-এর যুগে বিচারব্যবস্থা

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) কখনো কখনো বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আলাদা বিচারক নির্ধারণ করতেন। যেমন—কাআব ইবনে সুরকে বসরার বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আবার কখনো গভর্নরদের বিচারের দায়িত্ব দিতেন। যেমন—কাআব ইবনে সুরকে বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত করার পর বসরার তৎকালীন গভর্নরকে তিনি প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি বিচারকাজও করার আদেশ দেন। অনুরূপভাবে উসমান (রা.) ইয়ালা ইবনে উমাইয়াকে সানআর গভর্নর ও বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। (আত-তারিখ, পৃষ্ঠা ১৭৯)

তবে উসমান (রা.)-এর শাসনকালে বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নররা নিজ দায়িত্বে নিজেদের বিচারক নির্বাচন করতেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেন। বোঝা যায়, এতে করে তাঁর শাসনামলে গভর্নরদের ভিন্ন রকমের মনোভাব বেড়ে গিয়েছিল।

আলী (রা.)-এর যুগে শাসনব্যবস্থা
ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) নিজ দায়িত্বে কুফায় বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণত গভর্নরদের পক্ষ থেকে বিচারক নির্ধারণ করা হতো। তবে অনেক বিচারককে আলী (রা.) নিজেই নিয়োগ করেছিলেন। (আল-ওলায়া ফিল বুলদান : ০২/৯৩)
খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচারব্যবস্থার উৎস ছিল কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা (ঐকমত্য), ইজতিহাদ ও পরামর্শ। তাঁদের যুগে সবচেয়ে বেশি ফিকাহতত্ত্ব ও বিধানজ্ঞানসম্পন্ন সাহাবা ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা, মুআজ ইবনে জাবাল, আবু মুসা আশ-আরি, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরাইরা, সালমান আল-ফার্সি, আবু সাইদ খুদরি ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জায়েদ ইবনে সাবেদ প্রমুখ সাহাবি (রা.)। (আলামুল মুআক্কিয়িন : ১/ ১৩)

শরয়ি আইন-বিধির প্রয়োগ

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচারকরা সব ধরনের বিচারকাজ সম্পন্ন করতেন। আর্থিক ক্ষতিপূরণ, পারিবারিক বিষয়াদি, আইন-বিধি ও বদলা-প্রতিশোধে ও পারস্পরিক সব রকমের অসুবিধা নিষ্পত্তি করতেন। বিচারকরা নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিগত মর্যাদাকেন্দ্রিক বিষয়াদির বিচার করতেন। কিসাস এবং আইনিবিধি ইত্যাদি খলিফা ও আঞ্চলিক গভর্নররা প্রয়োগ করতেন। তবে এর আগে অবশ্যই অনুমোদন করে নিতে হতো। তখন হত্যার শাস্তি ব্যতীত অন্যান্য কিসাসের বিচার-বিধান তাঁরা বাস্তবায়নের অধিকার পেতেন।

বিচারব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোনো স্থান নির্ধারিত ছিল না। বরং বিচারক নিজের বাড়িতে কিংবা মসজিদে বিচারকার্য বাস্তবায়ন করতেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তখন বিচারের কাজ ছিল খুবই কম। কালেভদ্রে দু-চারটি বিচার করতে হতো। ফলে বিচার ও আইনি ফলাফল বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করতে হতো না। স্বাভাবিকভাবে স্মৃতিতে গেঁথে যেত সবার। বিচারক অভিযুক্তকে তিরস্কার ও তদন্তের জন্য কারাবরণের দণ্ডাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। উমর, উসমান ও আলী (রা.) এমনটা করেছিলেন। তখন ইসলামী সরকার প্রধান শহরগুলোতে কারাগার স্থাপন করেছিল। আর মসজিদের বাইরে প্রতিশোধ কিসাস বাস্তবায়ন করা হতো। (আল-ইস্তিয়াব : ২/১০৬; আল-ইসাবা : ২/১৩)

আধুনিক সমাজে ন্যায়বিচারের সংকট: প্রধান ক্ষেত্র

ক. আইনের শাসনের অবক্ষয়:

- **দুর্বল বিচার বিভাগ:** অনেক দেশে বিচারালয় রাজনৈতিক প্রভাবাধীন, দুর্নীতিগ্রস্ত বা ধনী-শক্তিশালীদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট।
- **বিচারপ্রাপ্তিতে বিলম্ব:** দীর্ঘসূত্রতা, জটিল আইনি প্রক্রিয়া ও উচ্চ খরচের কারণে সাধারণ মানুষ ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত।
- **আইনের অপপ্রয়োগ:** "ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট" বা "সিডোমেল আইন"-এর মতো আইনকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে ব্যবহার।

খ. অর্থনৈতিক বৈষম্য:

- **ধনী-দরিদ্র ব্যবধান:** বিশ্বের ১% মানুষ ৪৫% সম্পদের মালিক (অক্সফাম রিপোর্ট, ২০২৩)। ইসলামের **জাকাত** ও সম্পদের পুনর্বণ্টন নীতির অনুপস্থিতি এই বৈষম্য বাড়িয়েছে।
- **শ্রমিক শোষণ:** নিম্ন মজুরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও শিশুশ্রম। কুরআনে বলা হয়েছে, **"শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও"** (ইবনে মাজাহ)।

গ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পক্ষপাত:

- **জাতিগত বৈষম্য:** বর্ণবাদ, অভিবাসী ও সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা (যেমন: ফিলিস্তিন, রোহিঙ্গা, ইউইঘুর)।

- **লিঙ্গভিত্তিক অসমতা:** নারী-পুরুষের বেতন ব্যবধান, যৌন হয়রানি ও সম্পত্তিতে অধিকার হরণ।
- **ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা:** ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধকরণ, ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য।

ঘ. রাষ্ট্রীয় জুলুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন:

- **নিরাপত্তার নামে নিপীড়ন:** গুপ্তচরবৃত্তি, গুমখুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা (যেমন: চীনের জিনজিয়াং, ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি বন্দিরা)।
- **মিডিয়া ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ:** সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার, সামাজিক মাধ্যম সেন্সরশিপ।

২. ইসলামী দৃষ্টিকোণ: কেন এই সংকট?

- **তাকওয়ার অভাব:** আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি মানুষকে ন্যায়বিচার বিসর্জন দিতে প্ররোচিত করে।
- **মাকাসিদ আশ-শরিয়া লঙ্ঘন:** ইসলামের ৫টি মৌলিক লক্ষ্য—**ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ** রক্ষা না করা।
- **সুদভিত্তিক অর্থনীতি:** সুদ (রিবা) সম্পদকে কুক্ষিগত করে, যা কুরআনে **"আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"** (২:২৭৯) বলে ঘোষিত।

---

৩. বর্তমান বিশ্বের কয়েকটি উদাহরণ

ক. জাতিগত বৈষম্য: জর্জ ফ্লয়েড হত্যা (মিনিয়াপলিস, ২০২০)

- **ঘটনা:** এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে আফ্রিকান-আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু।
- **ইসলামী প্রতিক্রিয়া:** রাসুল (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নীরব থাকে, সে জালিমের সহযোগী"** (তিরমিজি)।

খ. নারীর প্রতি বৈষম্য: সৌদি নারী অধিকার কর্মী লুজাইন আল-হাথলুল

- **ঘটনা:** মহিলাদের গাড়ি চালানোর অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করায় তাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

- **ইসলামী সমাধান:** ইসলাম নারীকে সম্পত্তি, শিক্ষা ও বিবাহে সমঅধিকার দিয়েছে (সূরা আন-নিসা ৪:১-৪)।

গ. রোহিঙ্গা গণহত্যা (মিয়ানমার, ২০১৭-বর্তমান)

- **ঘটনা:** সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালায়।
- **কুরআনের নির্দেশ: "কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে দূরে না সরায়"** (৫:৮)।

আধুনিক সমাজে প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধারের পথগুলো নিম্নে উল্লেখ্য

ক. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

- **জাকাত ও সাদাকাহ:** সম্পদের সুষম বণ্টন। হযরত উমর (রা.) বলতেন, **"যে সমাজে একজনও ক্ষুধার্ত থাকবে, আল্লাহর কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে।"**
- **সুদমুক্ত অর্থনীতি:** ইসলামী ব্যাংকিং ও মুদারাবা ব্যবস্থা চালু করা।

খ. আইন ও শাসনব্যবস্থা সংস্কার:

- **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** খলিফা উমর (রা.)-এর মতো শাসকদের অনুকরণে বিচারকদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।
- **জবাবদিহিতা:** শাসকদের জন্য **বাইয়াত** (শপথ) এবং জনগণের জন্য **হিসবা** (জবাবদিহিতা দাবির অধিকার)।

গ. শিক্ষা ও সচেতনতা:

- **ন্যায়ের মূল্যবোধ চর্চা:** পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদিসের নীতিমালা শেখানো।
- **মিডিয়ার ভূমিকা:** ইসলামী নীতির আলোকে সামাজিক সংস্কারের বার্তা প্রচার।

ঘ. আন্তর্জাতিক সংহতি:

- **উম্মাহর ঐক্য:** মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকারভিত্তিক জোট গঠন।
- **জুলুমের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর:** ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, রোহিঙ্গাদের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা।

আধুনিক বিচারব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রয়োগ

ক. ফৌজদারি আইন: সংশোধনমূলক ন্যায়

- **হুদুদ ও তাজিরের ভারসাম্য:** ইসলামে হুদুদ (অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি) কঠোর হলেও এর প্রয়োগের শর্ত এত কঠোর যে, রাসুল (সা.) বলেছেন, *"সন্দেহের ভিত্তিতে হুদুদ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকো"* (তিরমিজি)।
- **আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা:** শাস্তির চেয়ে অপরাধের মূল কারণ (যেমন: দারিদ্র্য, অশিক্ষা) দূর করার প্রতি জোর দেওয়া। উদাহরণ: নরওয়ের সংশোধনমূলক কারাগার ব্যবস্থা।

খ. পারিবারিক আইন: নারী-পুরুষের সমঅধিকার

- **মোহরানা ও ভরণপোষণ:** ইসলামে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। আধুনিক সমাজে এটি **যৌতুকপ্রথা বিলোপ** ও নারীর আর্থিক স্বাধীনতার মডেল হতে পারে।
- **তালাক ও মধ্যস্থতা:** কুরআনে তালাককে "নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ" বলা হয়েছে (সূরা আল-বাকারা ২:২৩১)। আধুনিক আইনে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা (Mediation) ইসলামী চেতনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

গ. সাইবার অপরাধ ও প্রযুক্তিনির্ভর বিচার:

- **গোপনীয়তা রক্ষা:** রাসুল (সা.) বলেছেন, *"অন্যের গোপনীয়তা তালাশ করো না"* (বুখারি)। এটি **ডিজিটাল গোপনীয়তা আইন** (যেমন: GDPR) এর সাথে মিলে।
- **ফতোয়ার আধুনিকীকরণ:** ইসলামী স্কলাররা **ক্রিপ্টোকারেন্সি, AI নৈতিকতা** ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদ (মাজহাবী ব্যাখ্যা) করছেন।

৩. ইসলামী ন্যায়বিচারের আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

ক. চ্যালেঞ্জ:

১. সেক্যুলারিজমের প্রভাব: অনেক রাষ্ট্রে শরিয়াহকে "রাজনৈতিক ইসলাম" হিসেবে দেখা হয়।

২. মূল্যবোধের সংঘাত: সমকামিতা, সুদভিত্তিক অর্থনীতির সাথে ইসলামী নীতির দ্বন্দ্ব।

৩. অপপ্রয়োগের ইতিহাস: কিছু দেশে শরিয়াহর নামে মানবাধিকার লঙ্ঘন (যেমন: মহিলাদের গাড়ি চালানো নিষেধ)।

খ. সমাধানের পথ:

১. মাকাসিদ আশ-শরিয়ার প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা: সমসাময়িক ফকিহরা শরিয়াহর লক্ষ্যগুলোকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করছেন। যেমন:

- **ইজতিহাদ:** ড. ইউসুফ আল-কারাদাওয়ি "ফিকহুল আকলিয়াত" (বুদ্ধিবৃত্তিক ফিকহ) এর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয় করেছেন।
- **ইজমা:** আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলো (যেমন: OIC) জলবায়ু সংকট, নারীর শিক্ষা ইত্যাদিতে ফতোয়া জারি করেছে।

২. বহুত্ববাদী সমাজে সহাবস্থান:

- **মদিনা সনদের আদলে:** ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা। উদাহরণ: মালয়েশিয়ায় ইসলামী ও সিভিল কোর্টের সমান্তরাল ব্যবস্থা।
- **আইনের বহুমুখীকরণ:** শরিয়াহকে ব্যক্তিগত আইন (পারিবারিক, উত্তরাধিকার) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখে ফৌজদারি আইনে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ।

ন্যায়বিচার পাওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার। সমাজে যত অন্যায়-অনাচার এর মূলে রয়েছে ন্যায়বিচারহীনতা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে অনাচার অনেকাংশেই কমে আসবে। সবাই সুফল ভোগ করবে। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশতভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে, ‘হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে তোমরা দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে, সে ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ্ উভয়েরই সর্বোত্তম অভিভাবক।

অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হও, সেজন্য তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা সত্য এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখো, তোমরা যা কর সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ পুরোপুরি অবগত আছেন।’ -(সুরা নিসা: ১৩৫)

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দ-ায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। -(সুরা মায়োদা: ৮)

আরও বর্ণিত হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-ফয়সালা কর, তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সদোপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শোনেন এবং দেখেন।‘ -(সুরা নিসা : ৫৮)

অন্য সুরায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপছন্দনীয় কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। -(সুরা আননহল : ৯০)

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করলে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে কোরআনে। বর্ণিত হয়েছে, ‘যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের।’ -(সুরা আল-মায়িদাহ: ৪৪)

ন্যায়ের বিধান সর্বকালের ও সব সমাজের জন্য। সব আসমানি কিতাবে এই নির্দেশ রয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, ‘স্মরণ করো দাউদ ও সোলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে, তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোনো সম্প্রদায়ের মেষ, আমি প্রত্যক্ষ করতে ছিলাম তাদের বিচার।’ (সুরা-আম্বিয়া, আয়াত: ৭৮)

আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়েছে।’ -(সুরা-৩৮ সদর, আয়াত: ২২ ও ২৬)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আজীবন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনো স্বগোত্রীয় মানুষের পক্ষপাতিত্ব কিংবা স্বজনপ্রীতি দেখাননি; বরং প্রতিটি মুহূর্ত নিজের কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সাহাবাদের মাঝে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

এবিষয়ে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মাখজুম গোত্রের এক চোর নারীর ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসুল (সা.)-এর প্রিয়তম ওসামা বিন জায়েদ (রা.) এ ব্যাপারে সুপারিশ করার সাহস করতে পারেন। সবাই মিলে সুপারিশের জন্য ওসামা (রা.)-কে নির্ণয় করলেন।

ওসামা নবী (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললেন। নবী (সা.) বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবী (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের আগের জাতি এ কাজই ধ্বংস করেছে যে যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট অভিজাত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর দ- জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত; তাহলে আমি তাঁর অবশ্যই (দ-বিধি অনুসারে) হাত কেটে দিতাম। -(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৭)

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুফল-

১. ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠাযে সমাজে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন আছে সেখানে প্রতিটি মানুষের জান-মাল, মানসম্মান ও অধিকার নিরাপদ। কেউ অন্যায় বা অপরাধ করলে যদি উপযুক্ত বিচার-ফয়সালা করা হয়। ন্যায়বিচার করা হয়; কারো পক্ষপাতিত্ব করা না হয়; কেবল তখনই সে সমাজে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এ জন্য মহান আল্লাহ তাআলা এ মর্মে নির্দেশ দেন-

وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا'

আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'

(সুরা নিসা : আয়াত ৫৮)

২.. সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসমাজ জীবনে মানুষকে অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ছিনতাই, খুন-খারাবি, হত্যা-লুণ্ঠন, জুলুম, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার-ব্যভিচার, শোষণ-নিপীড়ন ইত্যাদি কার্যকলাপ সমাজকে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সব সামাজিক অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়; তবে সে সমাজে অন্যায় ও অপরাধ প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তার লাভ করবে। ফলে সে সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। সে সমাজ আর মানুষের বাসোপযোগী থাকে না। সুতরাং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য।

৩. অধিকার প্রতিষ্ঠাসমাজের শক্তিশালীরা যেন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে না পারে; অন্যের সম্পদ যাতে জোরপূর্বক ভোগ-দখল করে নিতে না পারে; সবাই যেন পুর্ণ মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্যেমানুষের অর্থনৈতিক জীবনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও লেন-দেনে সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সীমাহীন। দ্রব্য-সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া, ওজনে কম-বেশি করা, পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বাজারজাত করা- এ সবই ব্যবসায়িক অসাধুতা সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা- وَ اَوۡفُوا الۡکَیۡلَ وَ الۡمِیۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ ... আর পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পরিপূর্ণ দেবে।... (সুরা আনআম : আয়াত ১৫২)

৫. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারসমাজ বা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুসংহত রাখতে অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। ন্যায়বিচার পরিপন্থী প্রশাসন ব্যবস্থা বেশি দিন টিকতে পারে না। একসময় প্রশাসনের প্রতি জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো ভেঙে যায়। তাই প্রশাসনিক মজবুতী ও সুষ্ঠুতার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. সাম্য প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারসমাজের সকল কর্মকাণ্ড যদি ন্যায়বিচারের সঙ্গে হয়, তবে সমাজের প্রতিটি লোকের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়। ন্যায়বিচার বা ন্যায়দণ্ডের ছায়াতলে সবাই ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে ন্যায়বিচারের অভাবে প্রতিহিংসা দানা বাঁধতে থাকে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়। ফলে একটা সময় চরম পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেন- اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ یَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ وَ الۡبَغۡیِ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।’ (সুরা নাহল : আয়াত ৯০)

৭. সাক্ষ্য ও বিচারকার্যে ন্যায়বিচারআল্লাহর দেওয়া আইন (কোরআন) ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী বিচারকার্যে এবং সাক্ষ্য প্রদানে শত্রু-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয়, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, আপন-পর, উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, জাতি-ধর্ম গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার প্রতিই সমান আচরণ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এ মর্মে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন

-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা বাবা-মার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।’ (সুরা নিসা : আয়াত ১৩৫)

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ন্যায়বিচারন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। শুধু তা-ই নয় আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারীকে ভালোবাসেন। মহান আল্লাহর ঘোষণাও এমনই

-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۟ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۟ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ‘َ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসেবে সদা দন্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।’ (সুরা মায়েদা : আয়াত ৮)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন বলেন ঘোষণা দেন-
فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ َ

‘... তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।’
(সুরা হুজরাত : আয়াত ৯)

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কতবেশি তা একটি হাদিস থেকেই প্রমাণিত। পরকালে ৭ শ্রেণির লোক আল্লাহর আরশের নিচে স্থান পাবেন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণি হলো- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী ইমামগণ।একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় সুখবর আর কী হতে পারে?

উপসংহার

ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুতি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। ন্যায়বিচার ছাড়া কখনোই সভ্য সমাজ ও উন্নত রাষ্ট্র গড়ার কল্পনাও করা যায় না। তাই ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে আমাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার কায়েম করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন!